APPENDIX - III

Adopted Slum Improvement Measures as reported by local Newspapers

12 THE STATESMAN FRIDAY APRIL 20 1990

New life for Rambagan's artistic slum dwellers

By a Staff Reporter

IN the heart of north Calcutta's dingy and congested Rambagan slum many among the over 2,000 slum dwellers who until some years ago were considered social outcasts and ostracized by all, have today become India's cultural ambassadors enthralling foreign audiences as distant as Moscow and Paris with their talent and skills in handicraft, puppetry and painting.

Nearly four decades of sustained and selfless work done by the monks of Ramakrishna Mission has brought about this magical transformation raising hopes for the depressed and deprived to survive with honour.

What had been started by the monks of the Mission as a modest social welfare scheme in 1952 has today grown into a massive project which includes a housing complex called Vivekananda Palli which will have 22 blocks — a total of 352 flats. The uniqueness of the Rs 1.5-crore housing project being built by the Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, with donations from home and abroad is that slum dwellers are being rehoused in the same area without being uprooted. It, however, still needs generous donations for the remaining 10 blocks.

All the 2,156 people living in the bustee are being provided with flats each having two rooms and toilet measuring 27.42 sq. metres. In addition, four flats in each floor will share a common space for social gathering.

The project is fruition of a long cherished dream of the monks of the Ramakrishna Mission to improve the living conditions and environment of the slum dwellers. The monks decided on the project after the slum dwellers were established socially, economically and culturally. "We had been planning to build this complex since the eighties and now that six blocks with 96 flats are ready for occupation, the residents are eagerly waiting to move in"; says Swami Asaktananda, Secretary Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, with a great sense of satisfaction.

A view of the housing complex set up to rehabilitate Rambagan slum dwellers. There are 22 such blocks, each consisting of 16 flats. — The Statesman.

This is natural for a person who for almost four decades has been working along with other monks for bringing all-round improvement in the lives of slum dwellers.

But the housing project forms only a part of work being done by the Ramakrishna Mission in the Rambagan slum, whose origin dates back to the days well before the arrival of Job Charnock at Sutanati. Initially the residents of Rambagan were "doms" who were brought by wealthy landlords for cremating bodies. In course of time, however, they fell prey to social evils and earned infamy.

In 1952, an enlightened resident of the area and a painter by profession, Jibankrishna Manik, drew the Ramakrishna Mission's attention towards the plight of the slum dwellers. Swami Lokeswarananda responded in a positive manner by making a survey of the area and its residents. He had the foresight to realize their artistic potential because most of the residents hailed from the traditional artisan families. The survey revealed that many were deft in making bamboo and cane products and efficient in music and painting. One of the residents, Bejoy Pakre, was a renowned sitarist.

As a first step the monks started with an adult education programme. Later, in 1957-58 a pre-basic school for children was opened. A charitable dispensary was also set up to take care of health problems. "But soon we realized that unless steps were taken for their economic betterment all our efforts would go in vain. So we decided to promote the sale of their bamboo and cane products and also helped them in developing new designs", says Swami Asaktananda.

For improving the craftsmanship of the slum dwellers, a tailoring centre for women and craft training centre for children were set up. All these steps coupled with constant guidance from Swami Lokeswarananda and other monks helped the Rambagan residents to improve their lot.

On any working day in its narrow lanes and by-lanes attentive artisans are busy in a variety of craft work. While some of them are busy in making cushions, baskets, furniture and various other items of cane and bamboo, others are making decorative structures used for festivals and functions.

Their decorative structures had formed part of Festival of India pavilions in Moscow and Paris. Besides, these artisans make statues out of bamboo and paper pulp. Almost every year the talented artisans of this settlement decorate the chariot of International Society for Krishna Consciousness during the "Rathayatra festival".

Among the slum dwellers there are a good number of musicians. One of them, Baren Das, is well known for playing the tabla, dhol, drum and similar musical instruments. He proudly recalled his experience as a teacher in music in the nearby Ramakrishna Mission unit and also his memorable performances on TV, radio and big cultural festivals. He received an award from Indira Gandhi in Delhi.

Prafulla Hazra, another veteran tabla player and a resident of the slum, said that he had performed with noted singers like Indubala, Firoza Begum and Kamal Dasgupta. He also toured abroad. "We in the slum could have never hoped to achieve all this unless the monks and social workers of the Jana Kalyan Samity came forward to help us", he said.

Among the performers, Nripendranath Ghorui is perhaps the most famous. A puppeteer by profession his team, Calcutta Theatrical Putulnach, has earned appreciation from critics here and abroad. "For my success and international exposure I am indebted to the Ramakrishna Mission", he said and narrated how the monks and social workers helped in promoting the latent talents of the slum dwellers. "Their help and guidance have spawned an abundance of artistic talents that have changed the character of Rambagan, he added.

GANASAKTI, October 14, 1989
গণশক্তি, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৮৯

উন্নয়নের ছোঁয়ায় বদলাচ্ছে বস্তিজীবন

রঞ্জন সেনগুপ্ত

এক উঠোন বারো ঘর এই নিয়েই বস্তির জীবন। শহর কলকাতার বস্তি সম্পর্কে এই চিরাচরিত ধারণাটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে কারণ কলকাতার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের আশ্রয়স্থল বস্তির জীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে এরাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার আগ্রহী। বস্তি উচ্ছেদ করে বহুতল বাড়ি তৈরির কংগ্রেসী অপচেষ্টার মৃত্যু হয়েছে। পরিবর্তে চলছে বস্তিকে রেখেই উন্নয়নের নানা পরিকল্পনা। সমস্যা আছে, তবে তা আগের মত তীব্র নয়। বস্তির ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ, পয়প্রণালী, আলো, স্যানিটেশন প্রভৃতি সবকিছুরই পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে। চেষ্টা চলছে বস্তিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির। তবে তা এখনও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এখনও কলকাতার বস্তি মানেই প্রায় আলো-বাতাসহীন, একই ছাউনীর তলায় পাশাপাশি কয়েকটি ঘর। বস্তি মানেই সরু সরু গলিপথ দিয়ে যাতায়াত এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা। এক কথায় পরিবেশটা ঘিঞ্জি ও ঘনবসতিপূর্ণ।

কলকাতা শহরের বস্তিগুলির নিজস্ব কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। পেশাগত দিকদিয়ে বিচার করলে দেখা যায় শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের বস্তিতে প্রায় একই পেশায় নিযুক্ত অনেক মানুষ একসঙ্গে বাস করেন। যেমন- কালিঘাটে পটুয়া; কুমারটুলিতে মৃৎশিল্পী ও গোয়ালা, নিমতলা ও জোড়াবাগানে চর্মকার ট্যাংরার একটি অংশ ও ধাপায় কাদুদার, কসবা, তিলজলা ও মানিকতলায় রজক, এন্টালী ও ফুলবাগান অঞ্চলে কারিগর, পাইকপাড়া ও গৌরীবাড়ি তে দর্জি, কাঁকুলিয়ার গৃহভৃত্য, খিদিরপুর ও কাশীপুর এলাকার শিল্প শ্রমিক, ওয়েলেসলি, বোনিয়াপুকুর ও পার্কসার্কাসে হকার ও ভেন্ডার, রামবাগান বস্তিতে নাটক ও যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা, ওয়াটগঞ্জে ও চৌরঙ্গীতে দেহপসারিনী প্রভৃতি। শহরের বস্তিগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ত্রিস্তর কাঠামো। অর্থাৎ (এক), একজন বাড়িওয়ালা অর্থাৎ যিনি জমির মালিক, (দুই) একজন ঠিকা প্রজা বকা প্রমোটর অর্থাৎ যিনি বস্তির ঘর তৈরি করে দেন; (তিন) ভাড়াটিয়া অর্থাৎ ওই ঘরে বাস করেন। এখানে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বাড়িওয়ালা ও ঠিকা প্রজাদের অধিকার ঠিকা প্রজা আইনের দ্বারা পরিচালিত। যা অন্য কোন রাজ্যে নেই। দিল্লি, বোম্বাই ও মদ্রাজের বস্তিগুলির সঙ্গে কলকাতার বস্তিগুলির এক আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। কলকাতার সমস্ত বস্তিই কর্পোরেশনের অ্যাসেসমেন্ট খাতায় রেজিস্ট্রি করা আছে এবং ওই বস্তিগুলিকে আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের কর দিতে হয়। তাই আইনের দ্বারা স্বীকৃত এই বাসতগুলিতে পাকা দেওয়াল, টালি, টিন কিংবা অ্যাসবেসটারের ছাদ দেখা যায়। পাশাপাশি দিল্লি, বোম্বাই বা মদ্রাজের বস্তিগুলি পলিথিন সিট বা ওই জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে তৈরি। যেহেতু ওইসব রাজ্যের বস্তিবাসীদের বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন তাই ওই বেআইনী বস্তিগুলিকে যখন তখন উচ্ছেদ করা সম্ভব। কিন্তু কলকাতার বস্তিগুলির ক্ষেত্রে সে জিনিস হবার সুযোগ নেই।

কলকাতার বস্তিগুলিতে প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ বাস করেন, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। এরমধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ এসেছেন গ্রামাঞ্চল থেকে। বাকি ৫ শতাংশ বিভিন্ন শহরাঞ্চল থেকে। বস্তিবাসীদের শতকরা ৬৯ জন রোজের ভিত্তিতে কাজ করেন, শতকরা ১৬'৫ জন হকার, ভেন্ডার, মালপত্র দেওয়া নেওয়ার কাজ করেন এবং বাকি ১৪'৫ শতাংশ বস্তিবাসী বিভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। শতকরা ৯৫ ভাগ বস্তিবাসী অদক্ষ শ্রমিক এবং ৫ শতাংশ দক্ষ শ্রমিক। বস্তিবাসীদের শতকরা ৯৩ শতাংশের মাসিক আয় ২৫০ টাকার নিচে এবং বাকি ৭ শতাংশ ২৫০-৪৫০ টাকা মাসে উপার্জন করেন। এঁদের শতকরা ৭৯ জন নিরক্ষর, শতকরা ১৫ জন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং শতকরা ৬ জন উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন।

শহরের বস্তিবাসীদের বেশিরভাগটা এসেছে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল ও নিকটবর্তী রাজ্যগুলি থেকে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একত্রিত হয়ে বস্তিতে বাস করেন। যেমনঃ চেতলা, কাশীপুর বস্তিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী, এন্টালী, বন্দেল গেট বস্তি এলাকায় খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী, খিদিরপুর, রাজাবাজারের বস্তিতে মুসলমান ধর্মাবলম্বী প্রভৃতি। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন খোঁজা মুশকিল। বস্তিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে নিজেদের মধ্যে সহমর্মিতা। যা শহরের অ্যাপারটমেন্ট কালচারে বিরল। যদিও অপরিচিত কোন মানুষকে বস্তিবাসীরা নিরাপত্তার কারণে সহজে গ্রহণ করে নেয়না। দু'মুঠো অন্নের জন্য একটি বস্তি পরিবারের পুরুষ ও মহিলা দু'জনকেই বিভিন্ন পেশায় কাজ করতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, শিশু শ্রমের বেশির ভাগটাই আসে এই বস্তি অঞ্চল থেকে। কাকভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁরা অবসর বিনোদনের সময় কম পান। যেটুকু সময় পান, তা গল্প গুজব, মাঝেমধ্যে সিনেমা দেখেই কাটিয়ে দেন। বস্তিবাসীদের বেশিরভাগটাই একা একা থাকতে ভালো বাসেন না। সুখ-দুঃখের একদিন প্রতিদিন তাঁরা জোটবদ্ধ হয়ে কাটিয়ে দিতে চান।

স্বাধীনতার পর থেকে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, গরিব মানুষ শহরের বস্তিগুলিকে কেন্দ্র করে তাঁদের জীবনযাত্রা শুরু করেছেন। স্বাধীনতার আগে চরম দুর্দশা, স্বাধীনতার পর একদিকে জমিদারদের অত্যাচার, অন্যদিকে শাসক কংগ্রেস দলের নিপীড়ন এর বিরুদ্ধে লড়াই করেই বস্তি বাসীদের টিকে থাকতে হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের আশ্রয়স্থল যে বস্তি, সেই বস্তিকে রক্ষা করার মত কোন আইন কংগ্রেসীরা তৈরি করেনি। পরিবর্তে গরিব মানুষদের শহর থেকে বিতাড়িত করার জন্য প্রতি মুহূর্তে বস্তি উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করেছে কংগ্রেস দল। পঞ্চাশের দশকে সি আই টি তৈরি হবার পর বস্তি ভেঙে বড় বড় বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জমিদারি দখল বিল পাস হয়। কিন্তু বিলের আওতা থেকে কলকাতা ও হাওড়াকে বাদ রাখা হয়। ১৯৫৯ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বিধানসভায় বস্তি উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিল আনেন। কিন্তু ঐ সবের বিরুদ্ধে শহরজুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। বস্তিবাসীদের আন্দোলনকে সংগঠিত করতে সেই সময় গঠিত হয় বস্তি ফেডারেশন। এতে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। অতঃপর সরকার বাধ্য হয় কালা বিল প্রত্যাহার করতে। ঠিক হয়, বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কোন বস্তিকে উচ্ছেদ করা হবে না।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮১ সালে কলকাতা ও হাওড়া থেকে জমিদারি উচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি বিল বিধানসভায় পাস হয়। ১৯৮২ সালে এটিকে কার্যকরী করা হয়। নতুন এই আইনের ফলে জমির মালিক হয় সরকার। উচ্ছেদ হয় জমিদারি। স্বীকৃতি দেওয়া হয় বস্তি বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের স্বত্ব। সরকারী রেজিস্ট্রি খাতায় মালিক ও ভাড়াটিয়াদের নাম লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা হয়। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় 'বস্তি উচ্ছেদ নয়'। 'বস্তিকে রেখেই তার উন্নয়ন করতে হবে। ১৯৮২ সালে নতুন ঠিকা প্রজাস্বত্ব আইন তৈরি করা হয়। অতি সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশন বস্তিতে পাকা ও দোতলা বাড়ি তৈরি করার জন্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে শহরের বস্তি উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন আর্থিক সাহায্য করেনি। সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে বস্তি উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৪৭ কোটি টাকা চেয়েছিল। কিন্তু এপর্যন্ত তার এক পয়সাও পাওয়া যায়নি। এত বাধা, বঞ্চনাও আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার ও কলকাতা কর্পোরেশন বস্তি উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। জল সরবরাহের উন্নতির জন্য নতুন পাইপ লাইন ও নলকূপ বসানো, চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাইমারি স্কুল, জল নিকাশের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা, পাকা শৌচাগার, গলিপথগুলিতে আলোর ব্যবস্থা, প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা সুযোগসুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে। বস্তিবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য ক্ষুদ্রঋণ স্বনির্ভর প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এছাড়া আরও নানা প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। শহরের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের আশ্রয়স্থল বস্তিজীবন সম্পর্কে কলকাতাবাসীর ধারণাটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে বস্তির জীবন, বস্তির বারমাস্যা।